তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

জাতীয় শিক্ষা আইন-১৬ খসড়ার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি

শরীফুর রহমান আদিল

সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা আইন-২০১৬ প্রণয়ন করে। এর আগে আরও দুইবার এই আইনটি জনমত যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল তখন আইনের কিছু ধারায় জনমানুষের আপত্তি থাকায় তা প্রত্যাহার করে পুর্ণরায় গত ৩রা এপ্রিল প্রকাশ করে এতে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রাধান্য, সমতার নীতি অবলম্বন, গাইড বই ও নোট বইকে নিষিদ্ধ এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির সুযোগ করে দেয়ার বিষয়টি জনসাধারণের মাঝে বেশ প্রশংসনীয় হলেও এর কিছু ধারা নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ কিংবা দেশের সাধারণ জনগণের রয়েছে দ্বিমত কিংবা আপত্তি যেমন–

শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন প্রসঙ্গে : এ শিক্ষা আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে শ্রেণীকক্ষে কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষক কর্তৃক কোন শারীরিক শাস্তি কিংবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না আর এ বিধান ভঙ্গকারীকে অনধিক ১০ হাজর টাকা জরিমানা কিংবা তিন মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত করা হবে! বর্তমানে সমাজে যেভাবে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিংবা সমাজ যে কারণে আজ অনৈতিক হতে বাধ্য হচ্ছে তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আইন দায়ী ৪৫%। সরকার এসব অপরাধ দমনে শিক্ষকদের শক্তিশালী না করে শিক্ষার্থীদের কেন শিক্ষকদের অপমান করার হাতিয়ার তুলে দিচ্ছে? আমরা কি শিক্ষকের মর্যাদা কিংবা বাদশা আলমগীরের শিক্ষকের মর্যাদার কথা ভুলে গেছি? অথবা, এ ধরনের আইনের ফলে শিক্ষককে কি আর কেউ সম্মান করবে? এই ধরনের আইনের দ্বারা শিক্ষক তার ছাত্রকে পড়াতে হবে না বরং ছাত্রদের দেয়া কথা সব শিক্ষককে মানতে হবে কারণ না হলে যে শিক্ষকের এমপিও বন্ধ হয়ে যাবে।

বর্তমানে শহর ছাড়া মফস্বল গ্রামে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও অসচেতন থাকে সেক্ষেত্রে এইসব অসচেতন শিক্ষার্থীদের কিভাবে পড়ায় মনোযোগী করা হবে? যেহেতু এটি একটি সমন্বিত শ্রেণীকক্ষ থাকে তাই এসব শ্রেণীকক্ষে দুষ্ট প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবে কে? আর বুঝানোর পরও যদি সে শিক্ষার্থী না বুঝে এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সাথে বেয়াদবি কিংবা অন্যদের ডিস্টার্ব হয় এমন কিছু আচরণ করতে থাকে তবে শিক্ষককে তবু চুপ থাকতে হবে? শিক্ষক সব শিক্ষার্থীর সামনে অপমানিত হবে তবুও সে সব কিছুকে মুখ বুঝে সহ্য করে নিতে হবে? যেখানে শিক্ষকের কোন মূল্যায়ন থাকবে না সেখানে শিক্ষারও কোন উন্নতি হবে না আর নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ সেতো আকাশ কুসুম স্বপ্ন হয়ে যাবে। এমনও হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যে শ্রেণীকক্ষে পাঁচ- ছয়জন একসাথে হয়ে শিক্ষকের সামনে ভারতীয় গান দেখবে কিংবা এ বিষয়ে মন্তব্য করবে কিন্তু শিক্ষক কিছু বলার সাহস পাবে না! আবার এমনও অনেক পরিবার আছে যাদের অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে মানুষ করতে না পেরে শিক্ষকের নিকট বিচার নিয়ে আসে কিন্তু এই আইন বাস্তবায়ন হলে শিক্ষক কি বিচার করবে? জেলখানা স্কুলের নাম আমরা মোটামোটি সবাই অবগত আর এও জানি এই ধরনের স্কুল কাদের জন্য এবং কেন এই জেল স্কুল প্রবর্তন হয়েছে যদি এই আইনটি বাস্তবায়ন হয়েই যায় তবে জেল স্কুলের ধারণা মানুষকে ভুলে যেতে হবে। আর সবচাইতে বড় কথা হলো শিক্ষক দ্বারা কতজন শিক্ষার্থী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে অথচ ঢাবি, শাবি, জাবি, জবি, রাবিসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্যাতনের খবর হরহামেশাই হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোন সুরক্ষা আইন নেই! সুতরাং শিক্ষক শারীরিক শাস্তি দিলে তাকে তিরস্কার করা হোক কিন্তু শারীরিক ভাবে বেশি আঘাত করা যাবে না এবং শারীরিক শাস্তির একটা সীমা নির্ধারণ করা উচিত। মানসিক শাস্তি দিতে পারার অধিকার শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গভাবে থাকা উচিত কেননা, এটি না দেয়া হলে শিক্ষককে মানা কিংবা শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কোন কিছু থেকে বিরত রাখার আর কোন হাতিয়ার থাকবে না। শিক্ষক যদি ছাত্রের কৃতকর্মের জন্য কোন লজ্জা বা ভয় না দেখাতে পারে তবে সে শিক্ষার্থী ভালো হবে কিভাবে? অত্র আইনে এমন বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীর সবকিছুতেই শিক্ষককে নতি স্বীকার করে বলতে হবে জ্বি হুজুর, জ্বি হুজুর! অর্থাৎ তখন শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে! আর শিক্ষক হবে কেবল নামে কাজে নিধিরাম সর্দার!

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্যই কেবল এ আইন সরকারিদের জন্য নয় : এটি নামে একটি শিক্ষা আইন হলেও মূলত শাস্তি প্রদান কিংবা বেতন বন্ধের জন্য কেবলমাত্র এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বুঝানো হয়েছে কিন্তু কোচিং বাণিজ্য কিংবা প্রাইভেট টিউশনি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থ নেয়া হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি একইভাবে অন্যান্য যেকোন অপরাধের জন্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায় মুক্তি দেয়া হয়েছে সুতরাং এটি একটি একপক্ষীয় আইন, সার্বজনীন নয়। অন্যভাবে বলা যায়, এর দ্বারা এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতি সরকার নিরুৎসাহিত করেছে!

৪. নোট বই বা গাইড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করা: সরকার প্রায়শই নোট ও গাইড বইকে নিষিদ্ধ করার কথা জানালেও শিক্ষা আইন-১৬তে তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। প্রথম অধ্যায়ের ৭নং ধারার ৬ নং উপধারা, ৩য় অধ্যায়ের ২১নং ধারার ৫, ৬নং উপধারায় নোট, গাইড বই সম্পর্কে বরং অন্য নামে এটি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হলো– নোট বই বা গাইড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে সমস্যা কোথায়? সেক্ষেত্রে সহায়ক শিক্ষা উপকরণ কিংবা, সহায়ক পুস্তক এসব বলা মানে কি নোট বই কিংবা গাইড বইকে সমর্থন করা নয়?

৫ এমপিও স্থগিত করতে উৎসাহ : পরিশিষ্টের ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'এমপিও স্থগিত অথবা বাতিলকৃত কোন প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে এমপিওর শর্ত পুনরায় এমপিও ছাড়ের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে' তবে প্রশ্ন হচ্ছে স্থগিত কিংবা বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠান যদি সকল শর্ত পূরণ করার পরও তাদের এমপিও ফিরিয়ে দিতে দেরি হয় তবে কেন শর্ত পূরণ করার পরও সরকারের গাফেলতির জন্য তার বা, প্রতিষ্ঠানের বকেয়া দেয়া হবে না?

৬, যত দোষ শিক্ষকদের : এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটির দৌরাত্ম্যের কারণে শিক্ষকরা যে আজ নাজেহাল তা আজ সকলের নিকট ওপেন সিক্রেট; যেমন বিভিন্ন শিক্ষার মলাটে রাজনৈতিক সমাবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীও থাকা বাধ্যতামূলক করা নতুবা শাস্তির হুমকি দেয়া প্রভৃতিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আজ নাজেহাল অবস্থায় নিপতিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে যদি এসব পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় তবে তার দায় ভার শিক্ষক কেন বহন করবে? শিক্ষক কি এসব সদস্যদের মাঝে সমঝোতা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে কেননা, এসব সদস্য অধিকাংশই স্থানীয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা কিংবা ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আর্থিক দায় ভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে বলা হয়েছে কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান কোথায় থেকে এতো বিপুল অর্থের যোগান দিবে? আবার অন্যভাবে বলা যায় ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা পরিচালনা কমিটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি তবে প্রশ্ন হলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটি যদি কোন অসুষ্ঠু কাজ করে তবে তার দায় শিক্ষক সমাজ কেন নিবে?

৭. প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের উৎসাহ : প্রশ্নপত্র ফাঁস, বর্তমান বাংলাদেশে সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে শুরু হয়ে কোমলমতি শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি বর্তমানে একটি তিক্ত ও নির্মম বাস্তবতা হয়ে দাড়িয়েছে। বলতে গেলে বলা যায় এটি একটি বাংলাদেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার এক নতুন সংস্কৃতি। যাই হোক, স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এর পর ১৯৮০ সালে সরকার একে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি পাবলিক পরীক্ষা আইন প্রণয়ন করে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ১০ বছরের কারাদন্ডের বিধান রাখা হয় যদিও তখন প্রশ্নপত্র ফাঁস ততটা আলোচিত বা, ব্যাধিতে রূপ নেয়নি। বর্তমানে সবচাইতে আলোচিত ও সমালোচিত ব্যাধির নামে নামকরণ করা প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যখন সবাই সোচ্চার হলো এবং সকলের মুখে একটা ধ্বনিই উচ্চারিত হচ্ছিল আর তা হলো– এ ধরনের প্রশ্ন ফাঁসের সংস্কৃতি থেকে জাতি কবে মুক্তি পাবে? এই ব্যাধি থেকে বাচতে সবাইর আশা ছিল সরকার দেশ- জাতি এবং মেধাবীদের স্বার্থ রক্ষায় একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে একটি আইন করবেন বা, বিদ্যমান আইনের সংশোধন করবেন। সরকার বিদ্যমান আইনের সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে দ্বিতীয়বার শিক্ষা আইনের খসড়াটি মতামতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল আর তাতে ১৯৮০ সালের আইনের শাস্তি ১০ বছর থেকে নামিয়ে ৪ বছরে করার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় অত্র আইনের ৬৭ নং ধারায় বলা হয়েছিল যে– কোন ব্যক্তি পাবলিক পরীক্ষার কোনো প্রশ্ন ফাঁস করলে অথবা, জড়িত থাকলে অথবা, সহায়তা করলে তিনি সর্বোচ্চ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ লাখ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এই গুরু পাপে লঘু দণ্ডে সবাই সরকারের সমালোচনায় মুখর ছিলেন! আর এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষা আইন–২০১৬ এর যে খসড়া প্রকাশ করছে সেখানে প্রশ্নপ্রশ্ন ফাঁস এবং এর দণ্ড সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি! অথচ, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি হিসেবে যাবতজীবন জেল চেয়ে হাইকোর্টে এক আইনজীবী একটি রিট করেছিলেন, যা এখনো শুনানি হয়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষা আইনে কিছু উল্লেখ না করার ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এর মাধ্যমে সরকার কি প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের উৎসাহ দিচ্ছে? অথবা, এটাকে লঘু অপরাধ মনে করছে? নাকি একে একটি ব্যবসা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে? অথবা না পড়েও ঢালাওভাবে দেয়ার সরকারি কোন কৌশল? আবার আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বারংবার সংঘটিত হওয়া কোন বিদ্যমান আইনকে যেখানে কঠোর করা প্রয়োজন সেখানে আইনটির শাস্তি কমানের চিন্তা অপরাধ বৃদ্ধিও প্রবণতাকে সমর্থন দিচ্ছি নাতো? এই আইনের ফলে অন্যান্য অপরাধমূলক আইনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়বে নাতো?

৮. শিক্ষকদের মর্যাদা নিয়ে লুকোচুরি : এই আইনের শেষে সরকার সকল শিক্ষকের মর্যাদা প্রদান করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে সে মর্যাদা সমুন্নত করা হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষার্থীদের বেলায় যেমন কতগুলো আইন করে দিয়ে তা লঙ্ঘনে শাস্তির কথা বলা হয়েছে শিক্ষকদের মর্যাদার ক্ষেত্রে কেন তা হলো না?

৯. শিক্ষক অধীন আর শিক্ষার্থী স্বাধীন : প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দমিয়ে রেখে এবং শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এই স্বাধীনতার সীমা উল্লেখ না করায় এর অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শতভাগ এবং এরদ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনৈতিক কাজ কিংবা অসামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাবে, এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে কিছু বলতে কিংবা বাধা দিতে পারবে না। কারণ এতে শিক্ষার্থী স্বাধীনতা কিংবা অসম্মানবোধ করবে। ফলে শিক্ষার্থীকে তার মন মতো কাজ না করতে দেয়ার কারণে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক দন্ডিত করে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ পাবে, যা খুবই লজ্জা ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হবে। আমরা জানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা কোন বয়সে পড়াশুনা করতে আসে আর সে বয়সে তার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করলে যে কোন অনৈতিক কিংবা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে কিন্তু এবারের শিক্ষা আইনে শিক্ষার্থীদের সেই অনৈতিক স্বাধীনতাই দেয়া হলো!

পরীক্ষার ডিউটির ক্ষেত্রে : বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য সবচাইতে কষ্টদায়ক কাজ হলো পরীক্ষার হলে পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কেননা, কোন পর্যবেক্ষক হলে শিক্ষার্থীদের বিশৃঙ্খলা কিংবা পারস্পারিক সহযোগিতা করতে না দিতে চাইলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর রোষানলে পড়তে হয় এবং দায়িত্ব শেষে বাসায় ফেরার পথে অনেক শিক্ষক লাঞ্ছিত হতে হয়। কেননা, শিক্ষক যে হল পর্যবেক্ষণ করে তাতে পরীক্ষা দেয় অন্য কলেজের শিক্ষার্থী ফলে তারা এসব পর্যবেক্ষককে শিক্ষকের মর্যাদা দিতে চায়না আবার, শিক্ষার্থীদের রোষানল থেকে বাঁচতে যদি একটু উদার হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট এসে এই শিক্ষককে বহিষ্কার করে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা আইনে এসব পর্যবেক্ষকদের তাদের পর্যবেক্ষণ ভালোভাবে দিতে গেলে যদি কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে তাতে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই শিকক্ষক নিতে পারবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

এছাড়াও :

১. যদি কোন শিক্ষার্থী অর্ধ বার্ষিক কিংবা অন্য যে কোন মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে তবে শিক্ষক কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের কি করার থাকবে সে বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক কিংবা শিক্ষা প্রধানের কিছু না করারই থাকে তবে পাসের হার কমের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শোকজ কিংবা এমপিও বন্ধের শাস্তি আসবে কেন?

২. এই আইনে কখন কি অবস্থায় কি পরিমাণ চাহিদা থাকলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে সে সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ৩, বহুদিন থেকে শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য বলা হলেও শিক্ষা আইনে এ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকেছে।

৪. উচ্চশিক্ষা স্তরে নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সবমহল থেকে একধরনের দাবি আকারে উঠলেও এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই এ আইনে।

৫. শিক্ষকদের কোচিং কিংবা প্রাইভেট টিউশন বন্ধের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ কিন্তু পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত অতিরিক্ত ক্লাস যাতে বন্ধ না হয় কেননা, এমনও রয়েছে যে কোন শিক্ষার্থী সারা বছর পড়াশুনা করতে পারে না কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে তিন মাস শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারে।

৬. শিক্ষকদের অধিকাংশই নির্ভর করে প্রাইভেট কিংবা টিউশনির ওপর কেননা, তাদের সামান্য আয় কিংবা ৫০০ টাকার বাসাভাড়া দিয়ে সংসার চলে না কিন্তু প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি কিংবা বাসাভাড়া বাড়ানোর কোন লক্ষণ শিক্ষা আইনে নেই, যা শিক্ষককে সমাজের মূল স্রোত থেকে উপড়ে ফেলার মতো কাহিনী!

[লেখক : প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ফেনী সাউথ ইস্ট ডিগ্রি কলেজ]
adil_jnu@yahoo.com